লবণ কেন কম খাবেন

আমাদের শরীরে স্বাভাবিক কাজগুলো করতে দৈনিক ৫ গ্রাম বা এক চা চামচের বেশি লবণের দরকার নেই। বেশি লবণ শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। লবণের মূল কাজ পেশী এবং স্নায়ুর কাজে সাহায্য করা ও শরীরে জল নিয়ন্ত্রণ করা।

কাঁচা লবণ খাওয়ার চেয়ে বিভিন্ন খাবারের মধ্যে যে লবণ থাকে, তার মাধ্যমে শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় লবণ পেয়ে থাকি আমরা। লবণ বেশি খেলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় ব্লাড প্রেশারে। রক্ত চাপ বেড়ে যায়। সাথে বেশি লবণ খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে, হার্টে সমস্যা হয়, হাড় ক্ষয় বেড়ে যায়, পাকস্থলীর ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে, কিডনিতে বিভিন্ন জটিলতা বাড়ে।

দৈনন্দিন জীবনে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো ভালো থাকার একটি উপায়। দীর্ঘদিন বেশি লবণ খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে নিয়মিত বেশি লবণ খেলে অল্পতে দুর্বল লাগতে পারে। কারণ, অতিরিক্ত লবণ তখন শরীরে শক্তি তৈরিতে বাধা দেয়। শরীর ভালো রাখতে সামান্য লবণ হলেই চলে। এমনকি প্রাকৃতিক অনেক খাবারেই কম বেশি লবণ আছে।

যদিও আমরা বেশিরভাগ লবণ খেয়ে থাকি তরকারি থেকে নাস্তায়। ভাতের সাথে আলাদা করে লবণ খাবেন না। আচারে প্রচুর লবণ থাকে, পরিমিত খাবেন। সস, চানাচুর, মুড়ি, পিজা, ইনস্ট্যান্ট নুডুলস, বার্গার, চিপসে প্রচুর লবণ থাকে। সম্ভব হলে খাবারের টেবিলে আলাদা লবণদানী রাখবেন না।

তিন অভ্যাসে সুন্দর ত্বক

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে অনেকেই বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেন। কেউ পার্লারে যান। কেউবা ঘরোয়া উপায়ে রূপচর্চা করে থাকেন। অনেকে আবার বিভিন্ন প্রসাধনীও ব্যবহার করেন। ত্বকের হারানো ঔজ্জ্বল্য ফিরে পেতে চেষ্টার কমতি করেন না কেউই। তাতেও অনেক সময় সুফল পাওয়া

যায় না। ত্বক রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে যেতে থাকে। ত্বক বিশেষজ্ঞরা এর সমাধানও দিয়েছেন। তাদের মতে, সমস্যার উৎস থেকে সমাধান করা জরুরি। অর্থাৎ এত চেষ্টার পরেও কেন ত্বক রুক্ষ হয়ে পড়ছে সেই কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জেনে নেওয়া জরুরি নিজেদের কোন অভ্যাসের কারণে ত্বক তার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে।

ধূমপানের অভ্যাস: সিগারেটে নিকোটিনের পরিমাণ বেশি। অত্যধিক ধূমপানের কারণে নিকোটিন ত্বকের প্রতিটি কোষে পর্যাপ্ত পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহে বাধা দেয়। নিকোটিন ত্বকের প্রয়োজনীয় পুষ্টি কোলাজেন এবং প্রোটিন তৈরি হতে দেয় না। ধূমপান অকাল বার্ধ্যক্যের কারণ হতে পারে।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে মুখ না ধোয়া: রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ত্বকের যত্ন নেওয়া রূপ রুটিনের একটি বড় অংশ। সারাদিন ধরে ত্বকের কোষে ধুলা ময়লা জমতে থাকা। সেগুলো দীর্ঘক্ষণ ত্বকে থেকে যাওয়ার ফলে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে এবং রাতে শোয়ার আগে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নেওয়াটা জরুরি।

রাতে দেরি করে ঘুমানো: পর্যাপ্ত ঘুম না হলে তার প্রভাব শুধু শরীরে নয়, ত্বকেও পড়ে। রাতে কোলাজেন তৈরি করে ত্বক। পর্যাপ্ত পরিমাণ না ঘুমালে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চোখের নীচের কালো দাগছোপের কারণও ঘুম না হওয়া। ত্বক ভালো রাখতে কমপক্ষে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

থাইরয়েড হরমোনে মুখের যেসব সমস্যা হয়ে থাকে

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে হরমোন উৎপাদন হয় তাতে শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলোর একটি থাইরক্সিন স্বাভাবিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

হাইপারথাইরয়ডিজমে ঘুমের সমস্যা, দ্রুত হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। যার কারণে রোগীর মনে দুশ্চিন্তা, বিরক্তিভাব ও অস্থিরতা বিরাজ করে

থাকে।

এর ফলে মুখের অভ্যন্তরে ঘা বা ক্ষত দেখা দিতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ হাইপারথাইরয়ডিজমে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে এবং পালপিটেসন হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মুখ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. ফারুক হোসেন।

হরমোনে দীর্ঘমেয়াদে বার্নিং মাউথ সিনড্রোম বা মুখে জ্বালাপোড়া হতে পারে। কখনও কখনও হাইপারথাইরয়ডিজমে জগ্রেনস সিনড্রোম দেখা দিয়ে থাকে, যার কারণে শুষ্ক মুখের সৃষ্টি হয়। শুষ্ক মুখের প্রভাবে দন্তক্ষয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যেহেতু লালার প্রবাহ স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকে।

হাইপারথাইরয়ডিজমে পেরিওডন্টাল রোগ, ম্যাক্সিলারি বা ম্যান্ডিবুলার অস্টিওপরোসিস এবং দাঁত তাড়াতাড়ি উঠে। এক্সরে করার সময় থাইরয়েড গ্রন্থিকে রক্ষা করার জন্য থাইরয়েড কলার ব্যবহার করা উচিত। থাইরয়েড গ্রন্থি রেডিয়েশনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল।

অতিরিক্ত এক্সরে বা রেডিয়েশন থাইরয়েড গ্রন্থির জন্য একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। হাইপারথাইরয়ডিজমের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে এবং গরম সহ্য করতে সমস্যা হয়। কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়ডিজম ক্রেটিনিজম নামে পরিচিত।

এ কারণে ঠোঁট পুরু, ম্যাক্রোগ্লসিয়া বা জিহ্বা বড় হওয়া, ম্যালঅকলুশন অর্থাৎ ওপরের এবং নিচের চোয়ালের কামড় দিলে স্বাভাবিক রিলেশন ব্যাহত হওয়া এবং দেরিতে দাঁত উঠে থাকে। পেরিওডন্টাল অবস্থা ভালো থাকে না।

কোনো ক্ষতস্থান ভালো হতে দেরি হয়। লম্বা সময় ধরে হাইপোথাইরয়ডিজমের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্রেনিওফেসিলয়াল গ্রোথ এবং ডেন্টাল ডেভেলপমেন্টের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ডেন্টাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ম্যান্ডিবুলার বা নিচের চোয়ালের দ্বিতীয় মোলার বা সাত নম্বর দাঁতের ইমপ্যাকশন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

হাইপোথাইরয়ডিজমের রোগীদের ক্ষত বা ঘা দেরিতে শুকায়, কারণ মেটাবলিজমের কার্যকারিতা কমে যায়। দেরিতে ঘা বা ক্ষত সারার জন্য

সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই দাঁত তোলা বা সার্জারির সময় সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু করতে হবে। হাইপোথাইরয়ডিজমের কারণে হার্ট বিট ধীরে ধীরে হতে পারে।

এছাড়া রোগীর কনস্টিপেসন দেখা দিতে পারে। কনস্টিপেসন হলে মুখে আলসার হতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজমের ক্ষেত্রে রোগী প্রায়ই ঠাণ্ডা অনুভব করার কথা বলে থাকেন।

রোগীর ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজম এবং হাইপারথাইরয়ডিজম উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর চুল পড়ে যেতে পারে। হাইপোথাইরয়ডিজমের কারণে বিষণ্ণতা, ক্লান্তিভাব এবং অলসতার অনুভূতির মতো লক্ষণসমূহ সৃষ্টি হতে পারে। বিষণ্ণতার কারণে মুখের আলসারসহ নানাবিধ রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

মুখের জ্বালাপোড়ার ক্ষেত্রে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া না গেলে তখন অবশ্যই একজন রোগীর সার্বিক শারীরিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে।

থাইরয়েড গ্রন্থির কোনো কিছু সন্দেহজনক হলে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা জানার জন্য। অতএব মুখের যে কোনো রোগের চিকিৎসায় রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

বদহজম হলে কী করবেন?

অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বদহজম হয়। আবার ভ্যাপসা গরমেও হজমে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

উৎসব-পার্বণে বেশি ভারি ও তেল-মসলাযুক্ত খাবার খেলে শুরু হতে পারে পেটব্যথা, পেট ফাঁপা, ঢেকুর ওঠা, পায়ুপথে বাতাস নির্গমন বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা। এগুলোর বেশিরভাগই হজমে গণ্ডগোলের কারণে হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন হারবাল গবেষক ও চিকিৎসক ডা. আলমগীর মতি।

বদহজম, অ্যাসিডিটি, পেটে অতিরিক্ত গ্যাস, ঢেকুর ও বাতাস নির্গমনের মতো বিরক্তিকর সমস্যা থেকে রেহাই পেতে কিছু পরামর্শ মেনে চলতে পারেন-

* খাওয়ার সময় তাড়াহুড়া করবেন না। সময় নিয়ে, ধীরে-সুস্থে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া শেষ করবেন। তাড়াহুড়া করে খেতে গিয়ে খাবার ঠিকমতো হজম হয় না। তা ছাড়া পেটে খানিকটা বাতাসও ঢুকে যায়।

* খাওয়ার সময় ও মাঝখানে বেশি পানি পান করলে পাকস্থলীর অ্যাসিড দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভালো করে খাবার ভাঙতে পারে না। তাই খাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট আগে এক গ্লাস পানি পান করুন। খাওয়ার সময় বেশি পানি নয়। খাওয়া শেষে আবার একটু সময় পর পানি পান করবেন।

* একেকজনের একেক ধরনের খাবার হজম করতে সমস্যা হয়। যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স (Lactose Inltolerance) আছে, তারা দুধ ও দুধের তৈরি খাবার খেতে পারেন না। অনেকের মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যে (যেমন : ফলের রস বা জুস, চকলেট ইত্যাদি) সমস্যা হয়। কারও সমস্যা হয় রুটি, যব বা ডালজাতীয় খাবারে। কার কোনটাতে সমস্যা, সেটা তিনিই ভালো ধরতে পারবেন। তাই বদহজমের রোগীর দুধ নিষেধ বা মিষ্টি নিষেধ-এ জাতীয় কথা ঢালাওভাবে বলা যায় না।

* ধূমপান, চুইংগাম চিবোনো ও স্ট্র দিয়ে জুসজাতীয় কিছু খেলে পেটে গ্যাস হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। তাই এ ধরনের অভ্যাস বর্জন করুন।

* পেটে গ্যাস সমস্যা তৈরি করতে পারে কৃত্রিম চিনি, অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবারও। তাই এগুলো খেতে হবে হিসাব করে।

* কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পেট ফাঁপে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে আঁশযুক্ত খাবার খান, পর্যাপ্ত পানি পান করুন।

মাংস বেশি খেয়ে ফেললে যা করবেন

ঈদুল আজহায় অপরিমিত খাবার খাওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে পাতে মাংসের আধিক্য থাকে। দু’এক টুকরো গরু কিংবা খাসির মাংস খেলে সমস্যা নেই। অতিরিক্ত মাংস খাওয়া মোটেও ঠিক নয়; যা শারীরিক অস্বস্তি ও

অসুস্থতার কারণ হতে পারে।

ঈদে অতিরিক্ত মাংস খেলে ফেললে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ ও ডায়েট কনসালট্যান্ট জান্নাত আরা ঊর্মি।

লাল মাংস প্রচুর জিংকসমৃদ্ধ, যা আমাদের রক্তশূন্যতা পূরণ করে। তবে এর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে।

লাল মাংসে (রেডমিট) প্রচুর পরিমাণে সাচুরেটেড ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল থাকে, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, গ্যাস্টিক ও কোলেস্টেরলের সমস্যা হতে পারে।

তবে অতিরিক্ত মাংস যদি খেয়েই ফেলেন, তবে কিছু কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে।

আসুন জেনে নিই বেশি মাংস খাওয়ার পর কী করবেন-

১. যেদিন মাংস একটু বেশি খাওয়া হবে, সেদিন অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি হাঁটুন। ২০-৩০ মিনিট হাঁটুন। এমনভাবে হাঁটতে হবে যেন গা থেকে ঘাম ঝরে। এতে বাড়তি ক্যালোরি পুড়িয়ে ফেলা সম্ভব হবে।

২. প্রতিদিন মাংস খাওয়া ঠিক নয়। প্রতিদিন মেন্যুতে মাংস বা মাংসজাতীয় খাবার না রাখাই শ্রেয়। ভর্তা, ভাজি, ডাল-ভাতের মতো সাধারণ খাবারই হবে সঠিক মেন্যু।

৩. মাংস বেশি খাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ হলে অ্যাপল সাইডার ভিনেগার পান করলে উপকার পাবেন। এক গ্লাস পানিতে এক চা চামচ এসিভি মিশিয়ে পান করুন।

৪. খেতে পারেন পুদিনাপাতার চা। এক মুঠো পুদিনাপাতা কুঁচি করে গরমপানিতে মিশিয়ে পান করুন। স্বাদের জন্য এতে মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন।

৫. মাংস খাওয়ার পর অস্বস্তি বোধ হলে লেবু, কমলালেবু ও মাল্টা ফল খেতে পারেন।

৬. হলুদ হল সবচেয়ে শক্তিশালী, যা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ধর্ম সম্পন্ন একটি প্রাকৃতিক উপাদান। কুসুম গরমপানিতে হলুদ গুঁড়া, লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন।

৭. মাংস বেশি খেলে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করতে হবে।

ঈদে সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই পরিমিত আহার

পশু কুরবানির মাধ্যমেই মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়। এ সময়ে প্রায় সব বাড়িতেই মাংসের আধিক্য দেখা যায়। এ কারণে বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় কুরবানির ঈদে মাংস খাওয়া হয় বেশি এবং তা হয় সময় ও হিসাব ছাড়া। অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতা। যেমন-বদহজম, পেট ফাঁপা, ডায়রিয়া, আমাশয়, পেটে ব্যথা, বমি ইত্যাদি। পেট ফাঁপার ফলে অনেক সময় মাথা ব্যথা ও অবসাদ দেখা দেয়।

যদিও গরু-খাসির মাংসের মধ্যে থাকে সব এমাইনো এসিড, লৌহ, ফসফরাস, ভিটামিন বি১ ও ভিটামিন বি২। এতসব পুষ্টি উপাদান থাকার পরও মাংস বেশি খাওয়া উচিত নয়। কারণ এতে হজমের ব্যাঘাত ঘটে।

দেখা যায় ঈদের দিনে সবজি একেবারেই খাওয়া হয় না। এই কারণে টকদই, লেবু, শসা, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ দিয়ে সালাদ করে খেলে ভালো হয়। আবার বিভিন্ন ধরনের সবজি হালকা তেল মসলা দিয়ে রান্না করে অথবা চাইনিজ ভেজিটেবল করে খাওয়া যেতে পারে। সবজির মধ্যে কাঁচা পেঁপে থাকলে খুবই ভালো হয়। এতে মাংসের প্রোটিনের পাশাপাশি ভিটামিন ও খনিজ লবণের ঘাটতি হয় না। তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও বাঁচা সম্ভব। বাড়িতে যারা বয়স্ক লোক আছেন তারা শক্ত মাংস খেতে না পারলে তাদের সুসিদ্ধ মাংস, শামিকাবাব, কিমা রান্না, কলিজা ও মগজ ভুনা করে দিতে পারেন। এতে তারা ঈদের আনন্দ ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবেন।

রান্নার ফলে মাংসে নানারকম পরিবর্তন ঘটে। তাপে মাংসের প্রোটিন জমাট বাঁধে ও নরম হয়। তবে এতে যে কোলাজেন নামক প্রোটিন আছে, সেটা জমাট বাঁধে না। খুব বেশি তাপে মাংসের প্রোটিন কঠিন ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই শক্ত মাংস হজম করা কষ্টকর। সব ধরনের মাংসই কোমল হয় যদি অল্প আঁচে বেশিক্ষণ ধরে রান্না করা হয়। এতে

খাদ্যগুণের কোনো ঘাটতি হয় না।

গরু-খাসি অর্থাৎ রেডমিট শরীরের জন্য উপকারী হলেও এতে অনেক সময় বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। টিনিয়া সেলিয়াস নামক এক ধরনের পরজীবী রেডমিটে থাকে। যা দেহে বিশেষ ধরনের টিউবার কিউলোসিস (যক্ষ্মা) এর জন্ম দেয়। এই জাতীয় জীবাণু অন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃত প্রভৃতি জায়গায় প্রবেশ করে আমাদের অসুস্থ করে তোলে। অর্ধসিদ্ধ মাংসই দেহে এ ধরনের রোগের বিস্তার ঘটায়। এ কারণে শিককাবাব ও বারবিকিউ খেতে গেলে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ঈদের দিনে অনেকেই এ ধরনের খাবার তৈরিতে উৎসাহ দেখান। বিশেষ করে বাড়ির ছেলেদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায়।

এই গরমের মধ্যে অনেকের মধ্যে পানি স্বল্পতা দেখা যায়। এই কারণে যারা মাংস কোটা-বাছা এবং গোছাবেন, যারা রান্না ঘরে কাজ করবেন তাদের উচিত কিছুক্ষণ পরপর পানি পান করা। এছাড়া খেতে পারেন ফলের রস, লেবু-পুদিনার শরবত, তোকমার শরবত, ঘোল, মাঠা ইত্যাদি।

কিছু কিছু অসুস্থতায় মাংস কম খাওয়া ভালো। যেমন-ওজন বেশি থাকলে, পেটের সমস্যা অর্থাৎ লিভারের সমস্যা থাকলে, কিডনি রোগ থাকলে। এছাড়া আর্থ্রাইটিস, রক্তে কলস্টেরল ও ট্রাইগ্লাইসেরাইড বেশি থাকলে, হৃদরোগ থাকলে মাংসের চর্বি, কলিজা, মগজ, পায়ার স্যুপ (নেহারি), ভুঁড়ি বাদ দেওয়া ভালো।

সুতরাং, ঈদের আনন্দ পুরোপুরি পেতে হলে মাত্রাজ্ঞান রেখে এবং সতর্কতার সঙ্গে জীবাণুমুক্ত মাংস খাওয়া উচিত। একেবারে বাদ না দিয়ে সীমিত পরিমাণে, সময় মেনে মাংস খেলে তেমন অসুবিধা হয় না। সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিমিত আহারই উত্তম।

নিরাপদে কুরবানির কাজ সম্পন্ন করতে নিতে হবে বিশেষ স্বাস্থ্য সতর্কতা। যেমন-

কুরবানির কাজটি সম্পূর্ণ করতে অবশ্যই পরিষ্কার তিনস্তরের কাপড়ের মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস ও শুরুর আগে-পরে সাবান পানি বা জীবাণুনাশক লিকুইড ব্যবহার করতে হবে। তাহলে সংক্রমণের আশঙ্কা একদম কমে যাবে।

স্বস্তির কথা হচ্ছে মাংস থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা নেই বললেই চলে; কিন্তু যদি যে কোন অসুস্থ ব্যক্তি এসব কাজে যুক্ত থাকেন, তাহলে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে ছড়াতে পারে। তাই কুরবানির স্থানে বেশি লোকসমাগম করা যাবে না। অন্যবারের চেয়ে কম

সংখ্যক সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ রাখুন কুরবানির কাজে।

কুরবানি শেষে কুসুম গরম পানি ও সাবান দিয়ে ভালো করে গোসল করুন ও গায়ের পোশাক পরিবর্তন করুন।

নির্দিষ্ট স্থানে কুরবানির পশু জবাই করতে হবে। এবং পর্যাপ্ত পানি ঢেলে রক্ত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। পশু কুরবানির রক্ত গর্তে মাটি চাপা দিয়ে পরিবেশ স্বাস্থ্র্যকর রাখা যায়। এছাড়া যে স্থানে মাংস কাটা হবে সেখানে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

কুরবানির মাংস তিনভাগ করে এক ভাই অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করুন। এ বছর ভিড়বাট্টা পরিহার করা উচিত।

প্রতিবারের মতো কুরবানির বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। কুরবানিরকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুত অপসারণের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীকে সহায়তা করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনকে এবার স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচ্ছন্নতার দিকে একটু বিশেষভাবে ত্বরিৎ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের দিকে নজর দিতে হবে।

ব্যথার ওষুধ খাবেন নাকি ফিজিওথেরাপি নেবেন

ব্যথার ওষুধের ব্যবহার বাড়ছে দিন দিন। দীর্ঘমেয়াদে এই ওষুধ খেলে কিডনির সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাথানাশক ওষুধ, বিশেষ করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে এমন ওষুধ গ্রহণের বিরোধী।

এখন চিকিৎসার উদ্দেশ্য কেবল রোগ ভালো করা নয়, একটি রোগ ভালো করতে গিয়ে যাতে শরীরের অন্য ক্ষতি না হয়ে যায় সে দিকেও খেয়াল রাখেন চিকিৎসকরা। যেমন শারীরিক ব্যথা; ব্যথাবিরোধী ওষুধগুলো আমাদের শরীরে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করে থাকে, যা অনেক

সময় মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

ব্যথায় ওষুধ খাবেন নাকি ফিজিওথেরাপি নেবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডা. মোহাম্মদ আলী।

শারীরিক ব্যথার ধরন : যেসব শারীরিক ব্যথা আমাদের বেশি ভোগায় তার মধ্যে ঘাড়, কোমর, হাঁটু, কাঁধ, হাতের কুনুই, পায়ের গোড়ালি এবং পিঠ ব্যথা অন্যতম। চল্লিশোর্ধ্ব নারী-পুরুষ সবচেয়ে বেশি ভুগে থাকেন। যারা দীর্ঘ সময় অফিসে বসে কাজ করেন অথবা প্রতিদিন অফিসে যাতায়াতের জন্য যানবাহনে বসে থাকেন তাদের মধ্যে ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

এছাড়া ডায়াবেটিস রোগীদের ঘাড়, কোমর, হাঁটু ও কাঁধ ব্যথা বেশি হয়। তাছাড়াও যারা ভারি কাজ অথবা সংসারের কাজ যেমন কাপড়কাঁচা ঘরমোছা ইত্যাদি অত্যধিক পরিমাণে করে থাকেন তাদেরও ব্যথায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

ব্যথার ওষুধ কীভাবে কাজ করে : ব্যথার ওষুধ গ্রহণের ফলে এর উপাদান পাকস্থলি থেকে রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায় এবং কোষ থেকে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটায় যা বিভিন্ন মেকানিজম (যেমন- পেইন গেট থিউরি)-এর মাধ্যমে ব্যথার স্থানের প্রদাহ কমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যথার ওষুধ পাকস্থলি ও কিডনির মাধ্যমে শরীরে ছড়ায় বলে তা পাকস্থলিতে ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে অথবা আগে থেকেই পাকস্থলিতে ক্ষত বা আলসার থাকলে তা বাড়িয়ে দিতে পারে।

একইভাবে দীর্ঘদিন কিডনি দিয়ে ব্যথার ওষুধ নিঃসরণ হলে কিডনির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া ব্যথার ওষুধ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন- ঘাড় ব্যথার জন্য কেউ ব্যথানাশক সেবন করল, তা কি শুধু ঘাড়েই ছড়াবে? না, এই ওষুধের উপাদানগুলো রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে পৌঁছে যাবে এবং শরীরের সুস্থ অংশে অনাকাক্সিক্ষত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বিষয়টি মশা মারতে কামান দাগার মতোই অনভিপ্রেত। তাই দীর্ঘদিন ব্যথানাশক সেবন করলে তা শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই।

ফিজিওথেরাপি কীভাবে কাজ করে: ফিজিওথেরাপি স্থানীয় বা লোকাল চিকিৎসা। অর্থাৎ শরীরের যে অংশ ব্যথায় আক্রান্ত সাধারণত সেই অংশেই ফিজিওথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। শুধু ব্যথা নিরাময় ফিজিওথেরাপির উদ্দেশ্য নয়, ব্যথার কারণ নির্ণয় করে তা নির্মূল

করাই এর লক্ষ্য। ধরুন, পিএলআইডি বা কোমরের কশেরুকার চাকতি সরে গিয়ে তা স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে কোমর ও পায়ে ব্যথা সৃষ্টি করল।

এ ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধের কাজ কি? ব্যথানাশক কেবল সাময়িকভাবে ব্যথা কমাতে পারবে কিন্তু স্নায়ুর ওপর যে চাপ সৃষ্টি হল তা সরানোর ক্ষমতা ব্যথার ওষুধের নেই। পক্ষান্তরে ইলেক্ট্রোথেরাপির মাধ্যমে সাময়িক ব্যথা নিয়ন্ত্রণ এবং ম্যানিপুলেটিভ থেরাপির মাধ্যমে স্নায়ুর চাপ সরানো সম্ভব। অর্থাৎ ফিজিওথেরাপি ব্যথা ও ব্যথার কারণ দুটোর উপরেই কাজ করে।

তাই এটি দ্রুত ও কার্যকরি এবং যেহেতু এটি কিডনি ও পাকস্থলির ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাই এটি গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

অন্যান্য রোগে ফিজিওথেরাপি: ব্যথা ছাড়াও স্ট্রোক পারালাইসিস, বেলস পালসি ইত্যাদিতেও ফিজিওথেরাপি বেশ কার্যকর। মুখ বেঁকে যাওয়া বা বেলস পালসিতে রোগীরা প্রদাহ ও ভাইরাসবিরোধী ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ফিজিওথেরাপি নেয়া শুরু করলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। আর স্ট্রোক প্যারালাইসিস রোগীরা একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা নিলে স্ট্রোক নিরাময় হয়ে আবার কর্মক্ষমতা ও সচলতা ফিরে পেতে পারেন।

কোথায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পাবেন : সঠিক ফিজিওথেরাপির প্রথম ধাপ হল সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। ঠিক কি কারণে আপনার শরীরে ব্যথা হচ্ছে তা নির্ণয় করতে না পারলে কখনই ফিজিওথেরাপি ফলপ্রসূ হবে না। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়; হার্টের রোগ বা প্রেসার থেকে অনেক সময় ঘাড় কাঁধ বা বুক ব্যথা হতে পারে কিন্তু কারণ না জেনেই যদি এসব ক্ষেত্রেও ফিজিওথেরাপি প্রয়োগ করা হয় তা কি কাজ করবে?

তাই প্রথমেই ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞকে রোগ নির্ণয় করার সুযোগ দিতে হবে। আবার অনেকেই ফিজিওথেরাপির নামে না জেনে বিভিন্ন ধরনের ম্যাসাজ বা মালিশ বা টানাটানি করে থাকেন। এটিও হিতে বিপরীত ফল আনতে পারে। তাই একজন অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ফিজিওথেরাপি নিলেই তা সবচেয়ে ভালো ফল দেবে। যত্রতত্র গজিয়ে উঠা সেন্টারে ফিজিওথেরাপি না নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ফিজিওথেরাপি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। এ চিকিৎসা নিয়ে

অবহেলার সুযোগ নেই। একজন রোগীর সুস্থ হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই ফিজিওথেরাপি নেয়া উচিত। অনেই মনে করেন সাময়িক আরাম পাওয়ার জন্যই ফিজিওথেরাপি দেওয়া হয়।

ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। সাময়িক ব্যথা মুক্তির জন্য আপনি ব্যথানাশক খেতে পারেন, কিন্তু ফিজিওর মূল্য উদ্দেশ্য হল রোগীকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যথা ও ব্যথার কারণ মুক্ত করা এবং প্যারালাইসিসসহ অন্যান্য অচল রোগীর সচলতা ফিরিয়ে দেয়া।

হঠাৎ উচ্চমাত্রার জ্বর ও জয়েন্টে ব্যথা, কী করবেন

মৌসুমী রোগব্যাধির মধ্যে চিকুনগুনিয়া অন্যতম। এটি হচ্ছে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। হঠাৎ উচ্চমাত্রার জ্বর ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা এই রোগের অন্যতম কারণ।

এই রোগে মৃত্যু ঝুঁকি প্রতি দশ হাজারে এক জন বা এর চেয়েও কম। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই রোগের জটিলতা তুলনামূলক বেশি হয়।

চিকুনগুনিয়ার লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. তানভীর আহমেদ।

কীভাবে ছড়ায়

এই ভাইরাসটি মশার কামড়ের মাধ্যমে মানব শরীরে প্রবেশ করে। এডিস গনের দুটি প্রজাতি এডিস ইজিপ্টি ও এডিস এলবোপিকটাস এই ভাইরাসের বাহক হিসেবে পরিচিত। তারা মূলত দিনের আলোতে কাঁমড় দিয়ে থাকে। মানুষ ছাড়াও কয়েকটি প্রাণি বানর, পাখি, তীক্ষ্ণ দন্ত প্রাণী যেমন ইঁদুরে এই ভাইরাসের জীবনচক্র বিদ্যমান। রোগ সাধারণত রক্ত পরীক্ষা করে ভাইরাসের আরএনএ বা ভাইরাসের এন্টিবডির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

এই রোগের উপসর্গকে অনেক সময় ডেঙ্গু জ্বর এবং জিকা জ্বরের সঙ্গে ভুল করে তুলনা করা হয়। একক সংক্রমণের পর এটি বিশ্বাস করা হয় যে,

সাধারণত এই রোগটি শুরু হয় হঠাৎ করেই শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে যা সাত থেকে দশ দিন পর্যন্তও স্থায়ী হয়। জ্বর সাধারণত ৩৯০সে. (১০২০ ফা.) বা মাঝে মাঝে ৪০০ সে. (১০৪০ ফা.) পর্যন্ত হয়ে থাকে কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং আস্তে আস্তে কমতে থাকে। রক্তে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সাথে জ্বর আসে এবং রক্তে ভাইরাসটির মাত্রা যতই তীব্র পর্যায়ে পৌঁছায় লক্ষণগুলির তীব্রতাও সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভাইরাসটির রক্তে প্রবেশের পর যখন আইজিএম নামে একটি এন্টিবডি রক্তস্রোতের মধ্যে বাইরের থেকে প্রবিষ্ট রোগজীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ সৃষ্টি করে তখন এর প্রভাব কমতে শুরু করে। মাথা ব্যথা, অনিদ্রা এবং তীব্র অবসাদ সাধারণত পাঁচ থেকে সাত দিন থেকে যায়।

ভাইরাস পৃথকীকরণ, সেরোলজির মাধ্যমে পরীক্ষাগারে ভাইরাস শনাক্ত করা হয়।

প্রতিরোধ

এই রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী অনুমোদিত কোনো টিকা নেই। মশা নিয়ন্ত্রণ ও ঘুমানোর সময় মশারি টাঙিয়ে ঘুমানো, লম্বা হাতলযুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরে থাকা, বাড়ির আশেপাশে পানি জমতে না দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু স্ত্রী মশা দিনের বেলা কামড়ায়। এরা একবারে একের অধিক ব্যক্তিকে কামড়াতে পছন্দ করে। একবার রক্ত খাওয়া শেষে ডিম পাড়ার পূর্বে তিন দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এদের ডিমগুলো পানিতে এক বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। অল্প পরিমাণ জমে থাকা পানিও ডিম পরিস্ফুটনের জন্য যথেষ্ট। এডিস মশা স্থির পানিতে ডিম পাড়ে তাই বালতি, ফুলের টব, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে যেন পানি জমতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আম খেলে কি ভালো ঘুম হয়

সময়টা এখন ফলের রাজা আমের। দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে রসাল ও পষ্টিগুণে ভরপুর আম। অনেকেরই পছন্দ চিড়া-মুড়ির সঙ্গে আম খেতে। কেউ কেউ জুস করে খেতে পছন্দ করেন। আবার কেউবা আমভাত অথবা আস্ত

আমের স্বাদ নিতেই বেশি আগ্রহী। কিন্তু আম খাওয়ার পর কি হালকা ঝিমুনির ভাব আসে কিংবা শরীর এলিয়ে ঘুম ঘুম অনুভূতি হয়, এমন প্রশ্নের উত্তরটা চলুন জেনে নেওয়া যাক।

আমে প্রচুর পরিমাণে ট্রিপটোফ্যান থাকায় পর্যাপ্ত সেরোটোনিন তৈরি করে। আর সেরোটোনিন হচ্ছে ঘুমের জন্য দায়ী একটি নিউরোট্রান্সমিটার। এটি আম খেয়ে ঘুম পাওয়ার অন্যতম কারণ। কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ আম শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

রাতে ঘুমানোর আগে আম খেলে তন্দ্রাভাব বেশি হয় এই ইনসুলিন ট্রিপটোফ্যান মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্কে ট্রিপটোফ্যান থেকে বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটার সিনথেসিস হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম সেরোটোনিন। মস্তিষ্ক শীতল ও ঠাণ্ডা রাখে সেরোটোনিনন। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হলে শরীরও নিস্তেজ হতে থাকে। ফলে ঘুম পায়। আম খাওয়ার পর ঘুম পাওয়ার কারণ এটাই। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে আম খেলে তন্দ্রাভাব বেশি হয়। তখন শরীর এলিয়ে বিছানায় বা সোফায় ঘুমিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ রোগের লক্ষণ ও করণীয়

ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো একটি জটিল সমস্যা হলো স্লিপ এপনিয়া। স্লিপ এপনিয়া হলে ঘুমের মাঝে দশ সেকেন্ড থেকে কিছু মিনিট সময় ধরে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আর এ সমস্যাতে ঘুমের মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমাদের রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও কমে যায়। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্ক জেগে ওঠে এবং ঘুম ভেঙে যায়।

এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা ঘুম ভাঙার পর শ্বাস নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। খুবই জটিল অবস্থায় সারারাতে বারবার শ্বাস বন্ধ ও ঘুম ভাঙা এ চক্রটি চলতে থাকে। ফলে ঘুমিয়েও ঘুম পূরণ হয় না। এ ঘটনাগুলো যেহেতু গভীর ঘুমের মাঝে ঘটছে তাই রোগী তার এ

শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া সিওপিডির রোগীদের রাতের লক্ষণগুলো সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। রোগটি শনাক্ত করার প্রয়োজনে সিওপিডিতে আক্রান্ত ব্যক্তির মাঝে যদি কোনো রাতের উপসর্গ থেকে থাকে সেগুলো অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে অবহিত করা প্রয়োজন। এ উপসর্গগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির উপস্থিতি যদি সিওপিডির রোগীর মাঝে থাকে তবে চিকিৎসকে জানানো প্রয়োজন:

* রাতে নাক ডাকা

* রাতে হাঁপানি বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অনুভব করা

* সকালে মাথাব্যথা

* দিনেরবেলা অতিরিক্ত ঘুম

* স্থূলতা

* দিনেরবেলা রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকা

* দিনেরবেলা কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়া

* পালমোনারি হাইপারটেনশন

* ডানদিকের হার্ট ফেইলিওর

* পলিসিথেমিয়া (রক্তে লাল রক্ত কোষের উচ্চ ঘনত্ব)

* ডায়াবেটিস, হার্ট ফেইলিউর বা স্ট্রোকের ইতিহাস

এ ক্ষেত্রে চিকিৎসক ঘুমের পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীর ঘুমের অসুবিধাগুলোর ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে। পলিসোমনোগ্রাফি অথবা স্লিপ টেস্ট একটি সর্বাধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে খুব সহজেই এ রোগটি নির্ণয় করা যায়। ঘুমের পরীক্ষার/স্লিপ এপনিয়া পরীক্ষা, যা পলিসোমনোগ্রাফি (PSG) নামেও পরিচিত। এটি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন, রক্তের অক্সিজেনের মাত্রা এবং ঘুমের পর্যায় এবং ঘুমের মাঝের পরিবর্তনগুলো ব্যাপকভাবে ধারণ করা হয়।

এ পরীক্ষাটি দ্বারা ঘুমের মাঝে কখন, কতবার এবং কী ধরনের শ্বাস বন্ধ হচ্ছে তা বোঝা যায়। আবার কিছু রোগীর জন্য একটি বিকল্প হলো হোম স্লিপ টেস্ট (এইচএসটি), যেখানে রোগীরা তাদের নিজের বাসায় এবং নিজের বিছানায় ঘুমাতে পারে (যদিও পরীক্ষাটি ল্যাবে